পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাড়ল ৫৬.২৫ শতাংশ

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাড়িয়েছে সরকার। ৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার ৫০০ টাকা করা হয়েছে। মজুরি বাড়ানোর লক্ষ্যে গঠিত নিম্নতম মজুরি বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে এই মজুরি কার্যকর হবে এবং জানুয়ারি থেকে নতুন কাঠামোতে বেতন পাবেন পোশাক শ্রমিকরা।

সর্বশেষ ২০১৮ সালে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, পোশাক শ্রমিকরা ৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছিলেন। সেই হিসেবে আগের তুলনায় ন্যূনতম মজুরি বেড়েছে ৪ হাজার ৫০০ টাকা। মজুরি বৃদ্ধির হার ৫৬ দশমিক ২৫ শতাংশ।

মঙ্গলবার (৭ নভেম্বর) সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ তথ্য জানান শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশেই আমরা তৈরি পোশাক শ্রমিকের নূন্যতম মজুরি ঘোষণা করছি। তাদের তম মজুরি ৫৬ দশমিক ২৫ বাড়বে । শ্রমিকদের পক্ষে রেশনের দাবি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন একটা ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার কথা। পরবর্তী সময়ে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হবে।’

এর আগে বেলা সাড়ে ১২টায় রাজধানীর সেগুনবাগিচায় মজুরি বোর্ডের সভাকক্ষে এ সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয়।

এতে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি ছিলেন জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক-কর্মচারী লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি। অন্যদিকে মালিকদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি ছিলেন তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক সভাপতি ও স্টার্লিং গ্রুপের চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান।

বৈঠক শেষে সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ‘আগামী বছরের জানুয়ারি মাস থেকে মজুরি কার্যকর করা হবে। অর্থাৎ, ডিসেম্বর থেকে নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন হবে।’

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সচিব রাইসা আফরোজ, নিরপেক্ষ সদস্য অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য ও জাতীয় শ্রমিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহম্মদ। এ সভায় মালিকপক্ষ মজুরি বোর্ডের সভায় শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব দেয়।

আর একদিনও অবরোধ চায় না জনগণ, দুইদিনে ২১ যানবাহন পুড়ে ছাই

বিএনপি-জামায়াত ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর ডাকা ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ কর্মসূচিতে ২১টি বাসে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। এদিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে আগুন সন্ত্রাস দেখতে চায় না দেশের মানুষ। এব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

ঢাকার তিনটি প্রধান পয়েন্ট ফার্মগেট, কারওয়ানবাজার ও গুলিস্তান এলাকায় গাড়ি পোড়ানোর পরপরই বিভিন্ন পেশাজীবীর সাথে কথা বলে তীব্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। বাংলা মোটরে গাড়ি পোড়ানোর একঘন্টা পরে ওই এলাকায় কথা হয় হারুনের সঙ্গে। তিনি বলেন, চোখের সামনে গাড়ি থেকে লোক নামায়ে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। এরকম দেখতে চাই না।

বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত রকিবুল ইসলাম বলেন, ‘অর্থনীতি এবং মানুষকে জিম্মি করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার অধিকার কারও নেই। এটা বুঝতে পারলে ভালো। রাজনীতিতে অধিকার আদায়ের আন্দোলনের বিকল্প খুঁজতে হবে। আমরা যারা চাকরি করি তাদের জন্য হরতাল অবরোধ খুব শঙ্কার। একটা গোষ্ঠী ক্ষমতায় থাকবে, আরেকটা বিরোধী অবস্থানে থাকবে এটা মেনে দেশের জন্য কাজ করবে।’

সোমবার (৬ নভেম্বর) ছিল অবরোধের দ্বিতীয় দিন। এরপরপরই সন্ধ্যায় বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ৮ ও ৯ নভেম্বর নতুন করে অবরোধ ডাকা হয়েছে। একের পর এর অবরধে অর্থনীতি হুমকির মুখে পড়বে।

এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে অর্থনীতিতে ভয়ানক বিপদ ডেকে আনবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজনৈতিক দাবি-দাওয়ার অংশ হিসেবে হরতাল, অবরোধ জ্বালাও-পোড়াও, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, যান চলাচল ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং ভাঙচুরের ঘটনার প্রভাব ব্যবসায়ী ও সাধারণের আয় রোজগারের ওপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। হরতাল অবরোধে বহুমুখী ক্ষতির সম্মুখীন হয় দেশ।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, হরতাল অবরোধ এভাবে চলতে থাকলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক পণ্যের আনা-নেওয়া এবং আমদানি-রফতানি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে। এমন পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীরাও বিনিয়োগ করবেন না। তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন। রাজনৈতিক এই অস্থিরতার সুযোগে অনেকেই টাকা পাচার করবেন। তাতে ডলার সংকট আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। এর নেতিবাচক প্রভাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরও কমে যাবে।

বাসে আগুন দিয়ে অবরোধ পালনে বাধ্য করছে বিএনপি!

বিএনপির গত ২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজধানীসহ সারা দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় যেকোনও ধরনের নাশকতা ও সহিংসতা ঠেকাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হার্ডলাইনে থাকবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু এরপরও থেমে নেই নাশকতা।

রবিবার রাতে রাজধানীর নীলক্ষেত মোড়ে একটি প্রাইভেট কারে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে ওই ঘটনার কিছুক্ষণ পর কাওরান বাজার এলাকায় আরেকটি পিকআপ ভ্যানে আগুন দেওয়া হয়। গাড়িতে থাকা সোফা সেটে আগুন ধরলেও, স্থানীয়রা দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলে। রবিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর পল্লবীতে শিকড় পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। এসময় প্রত্যক্ষদর্শী হাসান বলেন, রাতে আগুন ধরিয়ে সকালে যারা বের হবে তাদের ভয় দেখানো হয়। এটা যানমালের ক্ষতি, সে হিসাব করে না। আমরা আর অবরোধ চাই না।

বিএনপি ও জামায়াতের ডাকা ফের ৪৮ ঘণ্টা (৫ ও ৬ নভেম্বর) অবরোধ কর্মসূচির আগেই শনিবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ও রাতে রাজধানীর পৃথক স্থানে পরপর চারটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এদিকে রবিবার (৫ নভেম্বর) সকাল ৬ থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দুটি বাসসহ একটি মিনি ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাস রয়েছে। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলামোটরে একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। প্রশ্ন উঠেছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাড়তি সতর্কতার পরও এত গাড়িতে অগ্নিসংযোগ কীভাবে হচ্ছে?

সোমবার অবরোধের দ্বিতীয় দিনে রাস্তাঘাট ছিলো তারপরেও অনেকটা স্বাভাবিক। ড্রাইভার ছাড়া নিজে গাড়ি নিয়ে বের হয়েছেন সেজান। তিনি বলেন, দশদিনের জন্য দেশে এসেছি। এসে এরমধ্যে পড়েছি। দিনের পর দিন বাড়িতে বন্দি করে রাখা এটা কেমন রাজনীতি?

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রথমে ৭২ ঘণ্টা তারপর ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ ঘোষণা করে দায় সারছে বিএনপি। তাছাড়া মাঠেও নেই তারা। শুধু জ্বালাও পোড়াও করে ভয় দেখিয়ে অবরোধ পালনে বাধ্য করছে। একের পর এক বাস পুড়িয়ে বাস্তার স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্ন করতে চেষ্টা করছে। এটা কোনো ভাবেই রাজনৈতক দলের কর্মসূচি হতে পারে না।

নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রতিরোধের জায়গায় জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে না পারলে চোরাগোপ্তা হামলা ঠেকানো যাবে না। একইসঙ্গে পুলিশের টহল আরও জোরদারের কথা বলছেন তারা। র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) জানিয়েছে, গোয়েন্দা নজরদারি কার্যক্রম চলমান থাকবে। কেউ যদি কোনও ধরনের নাশকতা কিংবা সহিংসতার পরিকল্পনা করে, সঙ্গে সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে। যেকোনও উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় র্যাবের স্পেশাল টিম ও স্ট্রাইকিং ফোর্স রিজার্ভ রাখা হয়েছে।

ব্র্যান্ড পোশাক স্টোর থেকে সরিয়ে নেওয়া নতুন কিছু নয়

বিভিন্ন দেশের নামীদামী ব্র্যান্ডের পোশাক বিভিন্ন সময় স্টোর থেকে তুলে নেয়। ক্রেতাদের অভিযোগ এবং সমালোচনার মুখে বা কোন ‘ভুল বুঝাবুঝির’ পরিস্থিতি তৈরি হলেও অনেক দেশেই অনেক নামীদামী ব্র্যান্ডের পণ্য সরিয়ে নেওয়ার নজির আছে। মূলত পোশাকের ডিজাইন, লেখা এমনকি রং নিয়েও সমালোচনার মুখে পোশাক বাজার থেকে তুলে নেওয়ার ঘটনা আছে। দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সম্প্রতি বাংলাদেশের তৈরি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের পোশাক তুলে নেওয়ার খবরে তাই উৎকণ্ঠিত হওয়ার কিছুই নেই বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

তৈরি পোশাক প্রস্তুকারকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ব্র্যান্ডের ক্রেতাদের অনেক চাহিদাপত্র থাকে। কাপড় নির্বাচন, পোশাকের আনুসাঙ্গিক উপকরণ সবই ক্রেতার সিদ্ধান্তে অনুমোদিত হয়ে থাকে। সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই দেশের বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। গুণগত মান নিরীক্ষা করে, স্যাম্পলের কোয়ালিটি চেকের পর প্রডাকশনে যায় কারখানাগুলো। আর পোশাক রফতানির আগে পুনরায় কোয়ালিটি চেকের পর তা জাহাজে পাঠানো হয়। ডিজাইন থেকে শুরু করে সব কিছুই নির্ধারণ করেন ক্রেতা, সুতরাং এখানে কারখানার দায় থাকার কথা না।

আগের বেশকিছু সিদ্ধান্ত অনুসন্ধানে দেখা যায়, ক্রেতাদের অভিযোগের মুখে বিভিন্ন সময় ব্র্যান্ডের পোশাক বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শুধু বাংলাদেশ না ভিয়েতনাম, চীন, কম্বোডিয়ার মতো দেশও আছে।

গত এপ্রিলে ওয়ালমার্টে বিক্রির জন্য জর্জ ব্র্যান্ডের টি-শার্ট এর গায়ে একটি ‘গালি’ লুকানো দেখে প্রতিষ্ঠানটি বাজার থেকে তা সরিয়ে নেয় বলে এক প্রতিবেদনে জানা যায়। ১১ এপ্রিল ডেইলি মেইলের বরাত দিয়ে ফক্স বিজনেসের একটি প্রতিবেদনে একথা বলা হয়। জর্জ ব্র্যান্ডটি ওয়ালমার্টের মালিকানাধীন।

পরিবেশপন্থী টিশার্টটি মানুষকে ‘পুনর্ব্যবহার’, ‘পুনরায় ব্যবহার’ এবং ‘পুনর্বিবেচনা’ করার আহ্বান জানাতে গিয়ে টি শার্টের গায়ে ‘আর-ই’ ব্যবহার করা হয় এবং ‘সাইকেল’ (রিসাইকেল), ‘ইউজ’ (রিইউজ), ‘নিউ’ এবং ‘থিঙ্ক’ শব্দগুলো একটু বেশি ডানে সরিয়ে দেওয়া হয়। আর

এতেই ঘটে বিপত্তি। তাদের আর-ই অক্ষরগুলো ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। হিতে বিপরীত হতে দেখা যায়।

এরপর গত মে মাসের শুরুতে প্রাইড মাস উপলক্ষ্যে চালু করা ‘টার্গেট’ ব্র্যান্ডের পণ্যগুলো নিয়ে নির্দিষ্ট গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়ার মুখে তাদের স্টোর থেকে কিছু পণ্য সরিয়ে নিতে হয়। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে একথা বলা হয়। উল্লেখ্য, প্রাইড মাস মুলত সমকামী সম্প্রদায়ের জন্য উৎসবের মাস হিসেবে উদযাপন করা হয়।

টার্গেট কর্পোরেশন (টিজিটিএন) তার ‘প্রাইড’ কালেকশনের অংশ হিসাবে পোশাক, বই, সংগীত এবং বাড়ির আসবাবপত্রসহ ২০০টিরও বেশি পণ্য সরবরাহ করছে। আইটেমগুলির মধ্যে রয়েছে “জেন্ডার ফ্লুইড” মগ, ক্যালেন্ডার এবং ‘বাই বাই, বাইনারি’, ‘প্রাইড ওয়ান, টু, থ্রি’ এবং “আমি মেয়ে নই” শিরোনামে ২-৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য বই।

এক বিবৃতিতে টার্গেট বলেছে, ‘এই বছরের পণ্যগুলো বাজারজাত করার পর থেকে আমরা আমাদের কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সুস্থতার বিষয়গুলো হুমকির মুখে পড়েছে।

এরপর গত আগস্টে কেনিয়ায় তৈরি শিশুদের প্রায় ৯৭ হাজার পিস জিন্সের প্যান্ট যুক্তরাষ্ট্রের স্টোর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় শিশুদের নিরাপত্তার স্বার্থে। সেদেশের গণমাধ্যম বলছে, প্যান্টের কাপড় থেকে শিশুদের শরীরের খোঁচা অনুভব হচ্ছে- এমন অভিযোগে সেসব তুলে নেওয়া হয়। একই অভিযোগে পণ্যগুলো কানাডার বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

ফাঙ্গাসের উপস্থিতির কারণে কানাডার টাইগার ব্র্যান্ডের কিছু পণ্য যেমন স্লিপওয়্যার, প্যান্ট এবং স্কি প্যান্ট প্রত্যাহার করা হয় গত জানুয়ারি মাসে। বানকি বার, বেলা অ্যান্ড বার্ডি, মাউন্টেন রিজ, সারভাইভাল গিয়ার এবং ক্যারিশমার মতো স্লিপওয়্যারগুলো প্রত্যাহার করা হয়। এছাড়াও পুরুষদের শেরপা পোশাক, পাজার স্কি প্যান্ট এবং পুরুষদের স্কি প্যান্ট ছিলো প্রত্যাহার করা পোশাকের তালিকায়।

হেলথ কানাডা ভোক্তাদের অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্থ পণ্যব্যবহার বন্ধ করতে এবং পুরো অর্থ ফেরতের জন্য জায়ান্ট টাইগারের কাছে ফেরত দিতে বলে।

গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে এক বার্তায় জায়ান্ট টাইগার বলেছে, ‘যেহেতু

আমাদের গ্রাহকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা আমাদের এক নম্বর অগ্রাধিকার, তাই আমরা এ বিষয়ে আমাদের বিক্রেতা এবং হেলথ কানাডার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছি।

বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা সামগ্রী প্রত্যাহার করা হলে সেটির তথ্য প্রকাশ করে ওইসিডি প্ল্যাটফর্ম। সেখানে গত অক্টোবর মাসে চীনের তৈরি শিশু পোশাক প্রত্যাহার করা হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে। পোশাকটির সমস্যা হসিএবে উল্লেখ করা হয়েছে- লেবেল থেকে ত্বকে খোঁচা লাগতো।

বাংলাদেশের ঘটনাকে আলাদা করে উল্লেখ করার মতো কোন বিষয় নেই। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ জানান, বাংলাদেশ সব সময় বায়ারের মানদণ্ড অনুযায়ী পোশাক বানায়। কিন্তু অভিযোগ বা মানদণ্ডগুলো সবই উক্ত পোশাকের ডিজাইন যারা করেছে, বা বিবরণ যারা ঠিক করেছে তাদের বিষয়। বাংলাদেশে বায়ারের সকল নির্দেশনা মেনে, বেধে দেওয়া মানদণ্ড মেনে পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তৈরি করা পোশাক তৃতীয় পক্ষের ইন্সপেকশন আর ল্যাব টেস্ট পাশ করার পরেই রপ্তানি করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পণ্যের চাহিদামাফিক মান রক্ষা করেই রপ্তানি করা হয়েছে।

যেমন হবে স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখা

আগামী দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে “স্মার্ট বাংলাদেশ” স্লোগান নিয়ে ইশতেহার প্রস্তুত করছে আওয়ামী লীগ। এজন্য চারটি বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছে দলটি। স্মার্ট বাংলাদেশের বিনির্মাণে চারটি মূল লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সোসাইটি এবং স্মার্ট ইকোনমি। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের জনগণ সবচেয়ে বেশি সরকারের সেবা পাবে এবং নিজেরাও আধুনিকে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবে বলে মনে করছেন আওয়ামী লীগের নেতারা।

ইশতেহার প্রণয়ন উপকমিটির আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অতীতে আমরা কী কী করেছি, আমাদের কী কী অর্জন রয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করা হয়। তার আলোকে নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করি আমরা।’

তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশের পরিকল্পনা পূর্বের বাস্তবায়িত ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিকল্পিত রূপান্তর। যা হচ্ছে বিশ্বয়ানের যুগের সমস্ত আধুনিক প্রযুক্তি আর সুবিধাদির সমন্বয়ে তৈরি। ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০০৯ সালে বাংলাদেশকে ডিজিটালাইজ করার জন্য নতুন নীতি ঘোষণা করেছিলো। বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ পাবলিক সার্ভিসকে ডিজিটালাইজ করা হয়েছে এবং দ্রুততার সাথে প্রতিটি মানুষের জীবনকে ডিজিটাল টুল দিয়ে চালনার একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে, যদিও গ্রামীণ এলাকায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো কঠিন। এই ডিজিটাল বাংলাদেশ ১৪ বছরের ব্যবধানে জীবনযাত্রার মানের ব্যাপক পরিবর্তনে অবদান রেখেছে।

ইশতেহার প্রণয়ন উপকমিটির সদস্যসচিব এবং আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ড. সেলিম মাহমুদ জানান, অনেকের কাছে ‘ডিজিটালাইজেশন’ নীতির সুবিধা ভোগ করে তা অস্বীকার করা বর্তমানে কঠিন হয়ে গিয়েছে। টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট সংযোগ, ডিজিটাল পরিষেবা, ডিজিটাল ফাইন্যান্স এবং ই-কমার্সের মতো বেশ কয়েকটি সেক্টরে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের প্রথম ধাপের সাফল্যের ওপর ভর করে, শেখ হাসিনা এখন বাংলাদেশিদের স্মার্টনেসের নতুন যাত্রা শুরু করতে অনুপ্রাণিত করছেন।

আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ নীতি এজেন্ডার বেশিরভাগ প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। সরকার বেশিরভাগ সেবা ডিজিটালাইজড করেছে। ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে ১৩ কোটির একটি স্থিতিশীল ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে। মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) ১৯ কোটিরও বেশি গ্রাহক রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন, ডিজিটালাইজেশন-সফলতা স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বাণিজ্য, এবং সামাজিক সুরক্ষা নেট পেমেন্টে পরিষেবার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখন স্মার্ট-এজেন্ডা একটি উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জ্ঞান-প্রযুক্তি-চালিত সমাজ তৈরির আরও বেশি সুযোগের প্রতিশ্রুতি দেয়।

স্মার্ট বাংলাদেশের মূল বৈশিষ্ট্য
স্মার্ট বাংলাদেশে লক্ষ্য হলো- মাথাপিছু আয় হবে কমপক্ষে ১২৫০০ ডলার; ৩%-এরও কম মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকবে; চরম দারিদ্র্য শূন্যে নামিয়ে আনা হবে। আর স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি মূল উপাদান রয়েছে- ১. স্মার্ট নাগরিক, ২. স্মার্ট সরকার, ৩. স্মার্ট সোসাইটি, এবং স্মার্ট ইকোনমি।

কেমন হবে স্মার্ট বাংলাদেশ
স্মার্ট বাংলাদেশ চারটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ফোকাস করবে। সেগুলো হলো- সংযোগ, ই-গভর্নেন্স, উদ্ভাবন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন। স্মার্ট বাংলাদেশ ন্যায়সঙ্গত অগ্রগতি ঘটাবে যেখানে প্রযুক্তি মূল সক্ষমতার ভূমিকা পালন করবে।
ইন্টারনেট অফ থিংস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স এবং বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্সের ব্যবহার প্রযুক্তি ইকোসিস্টেমকে রূপান্তরিত করবে। স্মার্ট বাংলাদেশ একটি টেকসই পরিবেশ তৈরির জন্য নবায়নযোগ্য শক্তি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষ পরিবহনের ওপরও জোর দেয়। স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য সাশ্রয়ী, সহজলভ্য, গ্রাহককেন্দ্রিক, কাগজবিহীন এবং নগদবিহীন জনসেবা প্রদান করা।

শূন্যের কাছাকাছি বৈষম্য
সব ক্ষেত্রে ডিজিটাল বিভাজন এর সেতু করে বৈষম্য দূর করতে চায় সরকার। স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় সরকার সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবে। এটি একটি প্রযুক্তি-সক্ষম স্মার্ট অর্থনীতি এবং সমাজের সুবিধা প্রদানের জন্য একটি নতুন পথরেখার সুচনা। দেশের গ্রামগুলোকে শহরের মতো আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে গড়ে তোলার নীতিমালা ইতিমধ্যেই চলছে।

অন্তর্ভুক্তি ক্ষমতায়ন
নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে একটি স্মার্ট জাতির জন্য স্মার্ট নাগরিক তৈরি করা এই নীতির উদ্দেশ্য। প্রযুক্তির পাশাপাশি মানবিক দক্ষতা নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করবে। নাগরিকরা সমস্যা সমাধানকারী হিসাবে বড় হবে যারা সমাধানের জন্য কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করবে না। এটি একটি প্রগতিশীল সমাজের কল্পনা করে যেখানে সমস্ত সদস্য অন্তর্ভুক্তির সুবিধা ভোগ করবে। সোসাইটি তার সদস্যদের উদ্ভাবক হতে উৎসাহিত করবে। “কেউ পিছিয়ে নেই” মন্ত্র নীতিনির্ধারণকে গাইড করবে।

তারুণ্যকে অগ্রাধিকার

বাংলাদেশে তারুণ্যের স্ফীতি আছে। আগামীতে দেশকে এগিয়ে নিতে আজকের তরুণরা স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। স্মার্ট বাংলাদেশ তরুণ প্রজন্মের চালিকাশক্তি হওয়ার সুযোগ তৈরি করবে। চতুর্থ শিল্প বিল্পব ইতিমধ্যেই চলছে যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ল্যান্ডস্কেপ পুনর্নির্মাণ শুরু করেছে। তরুণদের উন্নত দক্ষতা ও উদ্যোক্তা মানসিকতা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। বাংলাদেশের স্মার্ট-এজেন্ডা তৈরি হচ্ছে তার তরুণদের গতিশীলতার দ্বারা।

এই অবরোধে মানুষের আগ্রহ নেই, আছে বিরক্তি

আজ রোববার থেকে শুরু হয়েছে বিএনপির ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ। গত ২৮শে অক্টোবর সমাবেশ শেষে, ৩১শে অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর ৩ দিনের অবরোধ শেষে এই অবোরোধের ডাক দেয়। যদিও ২০১৮ সালে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার ডাকা লাগাতার অবরোধ এখনো চলছে। কারণ তিনি সেই অবরোধ শেষ করার ঘোষণা দেননি। পল্টন মোড়ের পানের দোকানদার ইস্রাফিল মোল্লা জানান, ৫ বছর আগের সেই অবরোধ বিএনপি দাপ্তরিক ভাবে না তুলে নিলেও তার মত ছোট ব্যবসায়ীসহ বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ জীবনের তাগিদে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করে নিয়েছিলেন। এবারো বিএনপির কর্মসূচির সেই অবস্থা হবে বলে আভাস দেন ইস্রাফিল।

কবে থেকে মানুষ আস্থা হারালো অবরোধের মত কর্মসূচীতে? এই প্রশ্নের জবাবে, সাবেক ছাত্রলীগ এবং বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতা হাসান তারেক জানান, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশে সবচেয়ে বড় বিবর্তন দেখা যায় ২০১৪ সালের বিএনপির ডাকা টানা অবরোধ কর্মসূচী থেকে। সেই প্রথম অবরোধের নামে শুরু হয় আগুন সন্ত্রাস। পেট্রোল বোমা, অকটেন দিয়ে চলন্ত যাত্রীবাহী বাস পুড়িয়ে দেয়া। অবরোধ না মানলে জনসাধারণের উপর হামলা, জানমালের ক্ষতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর হামলা এবং সর্বোপরি পুলিশের উপরে হামলা করতে দেখা যায় বিএনপির কর্মী সমর্থকদের।

শুধু ২০১৪ সালের নির্বাচন পূর্ব আর নির্বাচন উত্তর কর্মসূচীতে

২০০’শর বেশি সাধারণ মানুষ আগুনে পুড়ে মারা যায়। পুলিশ মারা যায় প্রায় ৭০ জনের মতো। আবার সেই অবরোধ শুরু হলো। এরইমধ্যে চোরাগোপ্তা হামলাও শুরু হয়ে গেছে। ২০২৩ সালে এসে সেই একই ধারা বজায় রেখেছে তারা। কোনো মিছিল নেই, কোথাও রাস্তায় জড়ো হয়ে বসে থাকা নেই। কোথাও জনসম্পৃক্ততা নেই, কোন পোস্টার নেই, কোন লিফলেট নেই, শুধু হুটহাট করে গোপনে কয়েকজন বিএনপির দলীয় কর্মী এসে অতর্কিত হামলা করে আগুন দিয়ে আবার পালিয়ে যায়।

গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী গত ২৯, ৩০ ও ৩১ শে অক্টোবরের অবরোধে, গাড়ি পোড়ানো হয়েছে ৩১ টি। মারা গেছেন ২ জন পুলিশ অফিসার আর ৩ জন পথচারী। বিভিন্ন জায়গার চোরাগোপ্তা হামলা এবং আগুন ধরাতে গিয়ে জনগণের রোষানলে পড়ে আটক হয়েছে একাধিক বিএনপির নেতাকর্মী।

হাসান তারেক আরও জানান, ২০২৩ সালে এসেও দেখা যাচ্ছ, জনসম্পৃক্ততাহীন বিএনপি শুধু একটিই প্রতিবাদের ভাষা বোঝে- সেটা হচ্ছে সন্ত্রাস। একদিকে তারা গণমানুষের অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত এমন কোন দাবি সৃষ্টি করতে পারছে না, যাতে জনগন স্বেচ্ছায় সম্পৃক্ত হবে বা অংশগ্রহন করবে। দ্বিতীয়ত, তারা চেষ্টা করছে সরকার ও প্রশাসনকে ভয় দেখাতে ও জনগণের ক্ষতি করে সরকারকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করতে। এই দুই কারনেই তারা বেছে নিয়েছে আগুন সন্ত্রাস বা সহিংস সন্ত্রাসের মতো কর্মকাণ্ড। চোরাগোপ্তা হামলা করে, পুলিশ বা জনসাধারণকে হত্যা করে তারা চাইছে জান মালের উপর হুমকি সৃষ্টি করতে।

ইদানিং কালের অবরেধ নিয়ে, একজন বামপন্থী সাবেক ছাত্র নেতা বললেন, সাধারণ মানুষের দাবী-দাওয়া পূরণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল অবরোধ। বিএনপি জামায়াতের অপব্যবহারের কারণে এই কর্মসূচিটি খেলো হয়ে গেছে। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে ৬৬, ৬৯, ৭০ সালে তথা মুক্তিযুদ্ধের আগে অবরোধ করে পাকিস্থানি সামরিক শাসকের ভীত নাড়িয়ে দিয়েছিল বাঙালি। ৭১’এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষনার পর বাঙালি সর্বাত্মক অবরোধের মাধ্যমে, কার্যত বাংলাদেশ অচল করে দিয়ে স্বাধীনতার ভীত রচনা করে। বাংলার প্রতিটি মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল সেই কর্মসূচির প্রতি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও দেখা যায় মানুষের অধিকার আদায়ে কার্যকর হরতাল ও অবরোধের মত কর্মসূচি। ৯০ এর দশকের পত্রপত্রিকায় দেখা যায়, অবরোধ হয়েছে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের দাবিতে। তখন অবরোধের দিনে রিকশা ছাড়া কোন যানবাহন চলতো না ঢাকা শহরে।

‘৯৬ সালেও আওয়ামী লীগের ডাকা অবরোধে কার্যত অচল হয়ে যেতো ঢাকা শহর। ২০০৪ সালে সেসময়ের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেনেড দিয়ে হত্যার চেষ্টা এবং ২২জন আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীকে হত্যার প্রতিবাদে যে অবরোধ করেছিল আওয়ামী লীগ তাতেও মানুষ সর্বাত্মকভাবে অংশ নিয়েছিল। সেই সহিংসতার প্রতিবাদে সেদিন কোন সন্ত্রাস হয়নি। রাজনৈতিকভাবেই প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নেমেছিল হাজার হাজার মানুষ।

অবরোধের প্রভাব নেই রাজধানীতে

বিএনপি-জামায়াতের ডাকা টানা দুই দিনের অবরোধ শুরু হয়েছে। গত সপ্তাহের হরতাল ও ৭২ ঘণ্টার অবরোধের তুলনায় এবারের অবরোধের প্রথম দিন রবিবার রাজধানীতে যান চলাচল অনেকটা স্বাভাবিক রয়েছে। জনমনে কিছুটা আতঙ্ক থাকলেও জীবিকার তাগিদে কর্মস্থলে ছুটছেন মানুষ। রাজধানীর মিরপুর, গুলিস্তান, পল্টন, শাহবাগ, নতুনবাজার, গুলশান, বাংলামোটর ও কারওয়ান বাজার এলাকায় ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।

এদিকে রবিবার সকাল থেকে মিরপুর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল চলাচল শুরু হওয়ায় জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহউদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। রেলস্টেশনগুলোতে ছিলো উপচে পড়া ভীড়।

৫ নভেম্বর সকালে শনিরআখড়া, কাজলা এলাকা ঘুরে দেখা যায়, জীবিকার তাগিদে সকাল থেকেই ছুটছে লোকজন। উত্তরা থেকে ঢাকাগামী অফিসযাত্রীরা কিছুটা যানজটে পড়েছে। যানবাহন চলছে অন্যান্য স্বাভাবিক দিনের মতই। তবে অতীত অবরোধের অভিজ্ঞতায় কিছুটা আতঙ্ক কাজ করছে জনসাধারণের মধ্যে। তারা বলছেন, ককটেল বিস্ফোরণ, বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটিয়ে আতঙ্ক তৈরী করা হয়েছে বলে অনেকে ব্যক্তিগত গাড়ি বের করেনি। কিছুটা আতঙ্ক কাজ করছে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন রাকিব হাসান। তিনি বলেন,‘ কাল সন্ধ্যায় বাস পোড়ানোর কারণে একটু ভয় কাজ করছিলো। কিন্তু অফিসতো যেতে হবে। সকালে বের হয়ে দেখি অবরোধে তো সবকিছুই স্বাভাবিক। মানুষ এখন আর এসব কর্মসূচিতে সমর্থন দেবে না। অতীতে

দেখেছি অবরোধে ককটেল বিস্ফোরণ, যানবাহনে আগুন দেওয়ার মতো ঘটনা। তাই কিছুটা আতঙ্কে আছি।’

মতিঝিল ব্যাংক পাড়ার একজন কর্মকর্তা বলেন, অবরোধ ডেকে ফেললেই হলো? মানুষ দিনের পর দিন ঘরে বসে থাকতে পারবে? গত সপ্তাহে তিনদিন কাজ করতে পারেনি, জীবন স্বাভাবিক রেখে কর্মসূচি দিলে মানুষকে পাশে পেলেও পেতে পারে, অবরোধ ডেকে পাবে না। এই যে দেখে মনে হচ্ছে না কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি চলছে, সবকিছুই তো স্বাভাবিক এটা বিএনপির জন্য ভীলে হলো?

২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ ও সেখানে সৃষ্ট সহিংসতার পরে ২৯ অক্টোবর সারা দেশে বিএনপির ডাকা সকাল-সন্ধ্যার হরতাল পালিত হয়। এরপর রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ঘোষণা করেন, ৩১ অক্টোবর (মঙ্গলবার) থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত টানা অবরোধ পালন করবে বিএনপি ও এর শরিক গণতন্ত্র মঞ্চ। পরে জামায়াতও অবরোধের ডাক দেয়। সেটা শেষ হতেই ৫ও ৬ নভেম্বর আবারও অবরোধের ঘোষণা দেয় দলটি।

অবরোধে চুলাত ভাত ওঠে না, সে খবর রাহে কিডা?

‘পুরা দিনে একশ টেহাও বিক্রি হয় নাই। আমরাতো দিনের টাকা দিনে খাই। আজ আমাগো বাড়ির মানসের মুখে খাবার জুটবো না। সে খবর রাহে কিডা? রাস্তা ফাঁকা। লোকজন কেনে না। এসব ভাইব্যা রাইতে গুম হয় না। কী করে বাঁইচবো?’ কথাগুলো বলছিলেন ডাব বিক্রেতা রহিম মিয়া। তিনি বলেন, এখানে রোজ এতো লোক আসে। হাসপাতালের সামনে বসে থাকি। সেখানেও বিক্রি নাই। বাজারে গেলে অন্তত দু তিনশ টাকা লাগে। এসব কি তাদের জানা নাই?

বিজয় স্মরণি সিগন্যালে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন তিন হকার। সেখানে যেতেই তারা তাদের পণ্য কিনবো কিনা জিজ্ঞেস করে। অবরোধে বিক্রি হয় কেমন জানতে চাইলে কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বলেন, লোক কোথায় যে

কিনবে? গত সপ্তাহে তিনদিন গেছে অবরোধ, হরতাল গেছে, পুরা সপ্তাহেই বিক্রি নাই। লোকজনের মন ভালো না থাকলে সিগন্যালের জিনিস তেমন কেউ কিনতে চায় না। আমার স্ত্রী চন্দ্রিমার কোনায় ফুল বিক্রি করে। এই গন্ডগোলের মধ্যে ফুল কিনবে কে? যারা রাজনীতি করে মিছিল মিটিং করে তারা কি আমাদের কথা ভেবে করে? তারা কে ক্ষমতায় থাকবে কে যাবে সেসব নিয়েই ভাবনা। আমাদের খবর কেউ রাখে না।’

ব্র্যাকের গবেষণা বলছে, রাজধানীতে ৩ লক্ষের বেশি হকার কাজ করে। সাধারণত রাস্তায় চলাচল করা মানুষই এদের ক্রেতা। তারা কেউ নির্দিষ্ট জায়গায় বসেন, কেউ ঘুরে ঘুরে বিক্রি করেন। হরতাল অবরোধের মতো কর্মসূচিতে তাদের হয়রানি বেড়ে যায় কয়েক গুণ। বিক্রি না থাকায় একেবারে রোজকার খাবারের ওপর চাপ পড়ে।

বিএনপি-জামায়াতের দ্বিতীয় দফায় ডাকা অবরোধের প্রথম দিন ছিলো রবিবার। গত তিন দিনের অবরোধ ও একদিনের হরতালে দেশের বিভিন্ন স্থানে যাত্রীবাহী বাসসহ বিভিন্ন যানবাহনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে৷ এ নিয়ে শঙ্কায় পথে বাস নেই বললেই চলে। অবরোধের আগের রাত থেকেই রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া গেছে। এসময়ে অন্তত ৯টি বাসে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতর।

এদিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সাইনবোর্ড, শিমরাইল ও কাঁচপুরের তিনটি বাসস্ট্যান্ডে দূরপাল্লার বাসগুলোর বেশিরভাগ কাউন্টারগুলো ছিল বন্ধ। কয়েকটি কাউন্টার খোলা দেখা গেলেও পরিবহন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা বলছেন যাত্রী সংকটেগাড়ি ছাড়া হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে বাস চালানোর জন্য অভয় দেওয়া হলেও তারা বেশিরভাগই ভয় কাটিয়ে রাস্তায় নামতে পারেনি। জাহাঙ্গীর বলেন, ‘যাদের গাড়ি এখন পর্যন্ত পুড়েছে তারাতো আমাদেরই কেউ না কেউ। দেখেছিতো কী হয়রানির মধ্যে তাদের পড়তে হয়। গাড়িও পুড়বে আবার পুড়ানোর সঙ্গে কারা যুক্ত ছিলো সেই নিয়ে তাকেই জেরার মুখোমুখি হতে হয়। সেকারণে আয় বন্ধ করে বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে হয়।’

গাবতলী বাসস্ট্যান্ডে একটা ভ্যানের ওপর বসে চারজন আড্ডা দিচ্ছেন। এক কাউন্টার মাস্টার বলেন, ‘বাস চালাতে বলেছে, আমরাও গাড়ি প্রস্তুত করে বসে আছি। যাত্রী নেই। বাস ইচ্ছে করে চালাচ্ছি না এমন না। বাস না চললে মালিকের ১০ দিনেও কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আমার তো লস। আমরা যারা দিনের আয় রোজগার দিয়ে সংসার চালায় তাদের পয়সাটা আসবে কোথা থেকে সেটা কেউ একবার ভাবে না।’

এদিকে অবরোধের প্রথম দিনে রাজধানীর উত্তরা হাউজবিল্ডিং এলাকায় পুলিশের টহল গাড়িকে লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। ছোড়া ককটেল বিস্ফোরণে উত্তরা পশ্চিম থানার এসআই মাহবুব আলীসহ তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। ৫ নভেম্বর দুপুরে রাজধানীর উত্তরা হাউজবিল্ডিং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ককটেল নিক্ষেপের ঘটনায় জড়িত অভিযোগে গাজীপুর মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি কাজী মো. হাসানকে হাতেনাতে আটক করা হয়েছে।

বিএনপির শীর্ষ নেতাদের সমন্বয়হীনতায় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা

আন্দোলন নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর শঙ্কায় বিএনপির মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। এক দিকে নেতৃত্বের সংকট, আরেক দিকে সঠিক পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তের অভাবে আন্দোলনে নামার মনোবল হারিয়ে ফেলছেন তারা। নির্বাচনমুখি দল হলেও বিএনপির নির্বাচনের পথ পরিহার করে সহিংসতার পথ বেছে নেওয়ায় দলটির মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে চরম হতাশা নেমে এসেছে। দলটির মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে এমনটি জানা গেছে।

সরকারের পতন, নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর এক দফা দাবিতে টানা প্রায় এক বছর ধরে আন্দোলন করে আসছে বিএনপি। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৮ অক্টোবর রাজধানীর নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে মহাসমাবেশের ডাক দেয় বিএনপি। একই দিনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন সরকার বিরোধী জোটের শরিক জামায়াতে ইসলামী ও অন্য দলগুলোও সমাবেশের ডাক দেয়।

কিন্তু সমাবেশ শুরু হওয়ার হঠাৎ করেই দৃশ্যপট পাল্টে যায়। বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা যখন সমাবেশ মঞ্চে বক্তব্য রাখছিলেন তখন সমাবেশের কাকরাইল প্রান্তে দলীয় নেতাকর্মীরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সেই সংঘর্ষ মুহূর্তেই কাকরাইল ছাড়িয়ে ছড়িয়ে

পড়ে নয়াপল্টন, শাহাজাহানপুর, আরামবাগ, রাজারবাগসহ আশপাশের এলাকায়। সংঘর্ষের একজন পুলিশ সদস্য ও যুবদলের একজন কর্মী নিহত হওয়ার পাশাপাশি আহত হয়েছেন অনেকে। সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাও ছিলো ভয়াবহ। এছাড়াও পুলিশ হাসপাতালে হামলা, গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা হতবাক করে দেয় অনেককে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে ওইদিন কাকরাইল মসজিদের বিপরীতে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা, ভাঙচুরের ঘটনা ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

সমাবেশ করতে এসে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার ঘটনায় বিএনপি নেতাকর্মীদের একটা বড় অংশই হতবাক হয়েছেন। তাদের ভাবনাতেই ছিলো না এমন ঘটনা ঘটবে। তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা বলছেন, ২৮ অক্টোবরের ঘটনা বিএনপিকে অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছে। নেতৃত্বের দুর্বলতার এবং অদূরদর্শীতার কারণেই সেদিন ঘটনা ঘটেছে।

ময়মনসিংহ জেলা বিএনপির একজন নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমরা এক বছর ধরে যেভাবে দলটিকে এগিয়ে এনেছিলাম, সরকারের বিরুদ্ধে জনমানুষের একটা আস্থা তৈরি করেছিলাম ২৮ অক্টোবরের ঘটনা আমাদেরকে শেষ করে দিয়েছে।

নেত্রকোনা জেলা যুবদলের এক নেতা বলেন, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ একটা সমাবেশ যেভাবে অতিউৎসাহী নেতাকর্মীদের কারণে সহিংসতায় রূপ নিয়েছে তাতে দলের মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে হাতাশা দেখা দিয়েছে।

দলটির মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা বলছেন, ২৮ অক্টোবরের ঘটনার পর থেকে তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যার ফলে এখন দলের কোনো কর্মসূচিতেই মাঠ কর্মীদের পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। এর প্রমাণও ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। দল হরতাল ও অবরোধের মত কঠোর কর্মসূচি দিলেও দেশের বেশিরভাগ এলাকাতেই নেতাকর্মীদের হরতালের পিকেটিং বা অবরোধ সফল করে তুলতে মাঠে দেখা যায়নি।

বিএনপি নেতাকর্মীরা বলছেন, দলকে চাঙ্গা করতে এখন কৌশলের কোনো বিকল্প নেই। হুটহাট সিদ্ধান্ত নিয়ে এমন কোনো কর্মসূচি না দেওয়ার পক্ষে মত দিচ্ছেন তারা। বিএনপি কর্মীরা বলছেন, দলীয় নেতারা কর্মসূচী ঘোষণা দিয়েই শেষ। এটি কিভাবে, কারা সফল করে তুলবে সে নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো পরিকল্পনা নেই। তারা আরও বলছেন, যেহেতু আন্দোলনে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা বাড়ানো যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আরও দূরদর্শী চিন্তা করতে হবে। আত্মঘাতী

সিদ্ধান্তে নিয়ে দলীয় কর্মীদের গুলির মুখে ঠেলে না দেয়ার কথা বলছেন তারা।

এদিকে বিএনপি একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, আন্তর্জাতিক মহলের ‘আহ্বান ও সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও ২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে ওই দিন থেকে আজ অবধি সরকারের কঠোর অবস্থান চিন্তায় ফেলে দিয়েছে বিএনপিকে। মহাসমাবেশ পণ্ড হওয়ার প্রতিবাদে ‘হরতাল-অবরোধ’এর মত কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার পরও সরকারের ‘আচরণ’ নরম না- হয়ে বরং আরও কঠোর হয়েছে। এটা দলের মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের শুধু চিন্তায় ফেলেছে না, মনোবলও ভেঙ্গে দিয়েছে।

ওই সূত্র আরো জানায়, দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলের নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে একেবারে মাঠে কর্মসূচি বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেয়- তৃণমূলের এমন সংগঠকদের একের পর এক গ্রেপ্তার চলছে। ফলে দলে দেখা দিয়েছে নেতৃত্বের সংকট। এমতাবস্থায় অবরোধের মতো কঠোর কর্মসূচি চালিয়ে নেওয়া যাবে কি-না দলের মধ্যে এমন আলোচনা এসেছে।

অবশ্য বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা এ ব্যাপারে বলছেন ভিন্ন কথা। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব তিন দিনের অবরোধ কর্মসূচীর শেষ দিন গত বৃহস্পতিবার বিকেলে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, তাদের অবরোধ কর্মসূচি সর্বাত্মক সফল হয়েছে। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে সন্তুষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত বিএনপির আন্দোলন চলবে জানিয়ে তিনি ৫ ও ৬ নভেম্বর (রবি ও সোমবার) আরও দুই দিনের অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। বিজয় না হওয়া পর্যন্ত ‘একদফা’র আন্দোলন চলতেই থাকবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেন, ‘আর পিছু ফেরার সময় নেই। জুলুম-নির্যাতন, মিথ্যা মামলা- হামলা, গ্রেফতার করে আন্দোলন স্তব্ধ করার কোনো সুযোগ নেই। বিএনপির প্রতিটি কর্মীই নেতার ভূমিকা পালন করে এ আন্দোলনে সফলতা আনবে।’

তিনি বলেন, ‘সরকার পতনের একদফা দাবিতে আমরা শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অটল রয়েছি। যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে তা অব্যাহত থাকবে। দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনকে নস্যাৎ করা যাবে না।’

শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ছেড়ে কেন সহিংস বিএনপি?

বিএনপির সহিংস রাজনীতিতে ফিরে আসা নিয়ে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে যে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য এবং আগুন সন্ত্রাসের রাজনীতি শুরু করেছিল সেই পথেই আবার ফিরতে গিয়ে জামায়াতের সঙ্গে আবারও একাত্ম হয়েছে দলটি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ২৮ অক্টোবরের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে জামায়াতকে সাথে নিয়ে প্রথম থেকেই বিএনপি মারমুখী ছিল। বিএনপিকে যখন নয়াপল্টনে সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছিল ঠিক সেই সময় বিএনপির অনড় অবস্থান দেখে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে বিএনপি এবার সহিংস রূপে আবার ফিরে আসবে।

নয়াপল্টনে প্রাণঘাতী সংঘর্ষের পর অবরোধ কর্মসূচির নামে আবারো জ্বালাও পোড়াও ও আগুন সন্ত্রাসের ঘটনায় আবার প্রমাণ হয়েছে বিএনপি মুখে যতোই না করুক না কেন, জামায়াতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিলো এবং আছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন যে গত কয়েকদিন ধরেই জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির নতুন করে সম্পর্ক হয়েছে। এই সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে জামায়াত বিএনপির সাথে সমান্তরালভাবে আবার আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা শুরু করেছে। জামায়াত শাপলা চত্বর এলাকায় সমাবেশ ডেকেছিল। কিন্তু জামায়াত যেহেতু নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নয়, সেই জন্য শাপলা চত্বর এলাকায় সমাবেশ করার অনুমতি দেয়নি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। জামাত শেষ পর্যন্ত আরামবাগ এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করে। যেহেতু জামায়াত বিএনপির প্রধান মিত্র এবং তারা শাপলা চত্বরে সমাবেশ করতে পারছে না, সে কারণেই একটা ঘোলাটে পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য বিএনপি চেষ্টা করেছে।

তবে ২৮ অক্টোবরের হামলা ও নাশকতার মামলায় শীর্ষ নেতৃবৃন্দ আটকের কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন নেতার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু বিএনপির সহিংসতার পিছনের কারণ জানতে চাইলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দ্বিতীয় সারির এক নেতা বলেন, সহিংস হয়ে ওঠা ছাড়া এসময় বিএনপির আর

কোন পথ নেই। শেষ আঘাত হিসেবে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিলো। জনগণের এটুকু ভোগান্তি হবে সেটাও আমাদের হিসেব নিকেশের ভেতরই ছিলো। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে অন্য কিছু করার নেই।

২৮ অক্টোবর বিএনপি ও আওয়ামী লীগের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের দিন ব্যাপক সহিংসতায় এক পুলিশ সদস্যসহ দুই জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনার পর আটক করা হয়েছে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ আরো অনেককে। বিএনপির ডাকে ২৯ অক্টোবর সারাদেশে হরতাল পালিত হয়েছে। এই হরতালের সময় বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতাসহ মোট তিন জন নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে তিন দিনের সর্বাত্মক অবরোধ শেষে আবারও ৫ ও ৬নভেম্বর দেশব্যাপী অবরোধের ডাক দিয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, জামায়াতের খপ্পরে পড়েই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পথ ছেড়ে আবারও আগুনের পথে।

আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সহিংসতা বিষয়ে বলেন, ‘বিএনপি শুধু সন্ত্রাস চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তারা মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের মাধ্যমে তথ্য-সন্ত্রাস অব্যাহত রেখেছে। যার মধ্য দিয়ে তাদের চিরাচরিত মিথ্যাচার-অপপপ্রচার ও গুজবের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও গণতান্ত্রিক চেতনাকে ভুলণ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে সামরিক স্বৈরাচার জিয়াউর রহমান বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই উগ্র-সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাস বিএনপির রাজনীতির মূল অস্ত্র। এখন তারা তথাকথিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের আড়ালে পুনরায় সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে।’

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেন, ‘অবরোধের নামে জ্বালাও-পোড়াও, মানুষ হত্যা, আর অগ্নিসন্ত্রাস করে বিএনপি-জামায়াত জোট কার্যত দেশকে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে চায়। বিএনপি-জামায়াতের তথাকথিত আন্দোলনের ভয়ে কিংবা তাদের বিদেশি প্রভুদের ইচ্ছায় বাংলাদেশ চলবে না। বিএনপির আসল উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ নির্বাচন না, তাদের আসল উদ্দেশ্য আগুনসন্ত্রাস-সহিংসতা- নাশকতা-অন্তর্ঘাতের পথে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি করে নির্বাচন বানচাল করা এবং অস্বাভাবিক-অসাংবিধানিক সরকার আনা। বিএনপি জামায়াত সম্মিলিতভাবে যে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ করতে চেষ্টা করছে সেটা জনগন মেনে নিবে না।

তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপার্সন শমশের মুবিন চৌধুরী বীর বিক্রম বলেন, ‘২৮ অক্টোবর রাজনৈতিক দলের মহাসমাবেশ চলাকালে যে সহিংস ঘটনা ঘটেছে তা কোন ভাবেই কাম্য নয়। সহিংস ঘটনায় পুলিশ কনস্টেবল

পারভেজ তার দায়িত্ব পালনকালে দুর্বৃত্তের হামলায় মৃত্যুবরণ করেন, বাংলাদেশ প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবনে যে হামলা করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা জানাই। সরকারি হাসপাতালে অগ্নিসংযোগ দেওয়ার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। রাজনীতি দেশ এবং দেশের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। জীবন কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়। আমরা দেশের সুষ্ঠ রাজনীতির ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।’

সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক মনে করেন জামায়াত কোনদিনই বিএনপিকে ছেড়ে যায়নি। আর বিএনপি কৌশল হিসেবে জামায়াত বিচ্ছিন্নতা প্রমাণ করতে চেয়েছে। সামনে যাই দেখাক না কেনো তারা একই মায়ের পেটের সহদর। এটা বলছি তার কারণ তাদের জন্ম হয়েছে সন্ত্রাস করতে।